Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গণতন্ত্র ও ইসলামের সংঘাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 228020082

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গণতন্ত্র ও ইসলামের সংঘাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 228020082

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গণতন্ত্র ও ইসলামের সংঘাত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস, আইডিঃ 228020082 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গণতন্ত্র ও ইসলামের সংঘাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

জান্নাতুল ফেরদৌস

আইডিঃ 228020082

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

গণতন্ত্র কী ও এর সূচনালগ্ন 7

গণতন্ত্র একটি দীন 8

গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলনীতিসমূহ 10

গণতন্ত্র কেন কুফরি 15

পরিভাষা হিসেবে 'গণতন্ত্র' প্রয়োগ 19

গণতন্ত্র ও ইসলামি শূরাব্যবস্থা কি অভিন্ন 22

ইসলামি গণতন্ত্র : সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা 24

জামাআতবদ্ধ থাকা 29

ভোট ব্যবস্থা 32

গণতন্ত্র একটি আই ওয়াশ 34

বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের স্বরূপ 37

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। আর আমরা আমাদের অন্তরের খারাপ প্রবৃত্তি ও আমাদের খারাপ আমল হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না ।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

আল্লহ তাআলা বলেছেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۗ

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।

খিলাফাহর পতনের পর থেকে বিশ্ব শাসনের জন্য নতুন এক ব্যবস্থা আবির্ভূত হলো যার নাম-গণতন্ত্র। আল্লহর বিধানকে অসম্পূর্ণ ও তুচ্ছজ্ঞান করে মানবরচিত বিধানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টার ফসলই এই গণতন্ত্র। ধর্মহীনতার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিলো, বস্তুবাদের যে আগ্রাসন শুরু হয়েছিলো তারই ফসল গণতন্ত্র। গণতন্ত্র এখন বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই শিকড় গেড়ে আছে। অথচ গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের সংঘাতের বিষয়ে রয়ে গেছে অজ্ঞতা, বরং প্রশংসনীয় ও গ্রহনযোগ্য এক নীতি হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে। আফসোস যে অনেক ইসলামি স্কলারও এ ব্যাপারে সায় দিয়েছেন যা উম্মাহকে সংশয় ও ধোঁকার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। অবস্থার প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র ও ইসলামের সংঘাত নিয়ে আলোচনা জরুরি হয়ে পড়েছে।

আল্লহর কাছে সাহায্য ও কবুলিয়্যাত চেয়ে লেখাটি শুরু করছি। তিনি যেন হক্বের প্রতি আমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু রাখেন, সত্যনিষ্ঠতা ও অবিচলতা দান করেন, যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, যে নিয়্যাতে টপিকটি নির্বাচন করেছি তা কল্যাণের সাথে কবুল করেন। নিশ্চয়ই তিনি হক্বকে বিজয়ী করবেনই।

গণতন্ত্র কী ও এর সূচনালগ্ন

দুটি শব্দের সমন্বয়ে শব্দটি গঠিত: Demos অর্থ- সাধারণ মানুষ বা জনগণ। আর দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে-KRATIA অর্থ- শাসন। অতএব, ডেমোক্রেসি শব্দের অর্থ হচ্ছে- সাধারণ মানুষের শাসন অথবা জনগণের শাসন।

গণতন্ত্র বুঝতে হলে এর ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন।

গির্জা কর্তৃক চর্চিত যাজকতন্ত্রের জুলুম ও দৈহিক-চিন্তাগত আগ্রাসনের ফলস্বরূপ ফরাসি বিপ্লবের পর শাসনব্যবস্থা হিসেবে ইউরোপে গণতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করে। এই শোষণ ছিল জনগণ ও বিশেষভাবে বহু বৈজ্ঞানিক ইস্যুতে গির্জার বিরোধিতাকারী বিজ্ঞানী ও চিন্তকদের ব্যাপারে গির্জার কথিত আসমানি সত্যের একমাত্র ঠিকাদারিত্বের দাবি। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ঘটনায় তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যা থাকত, যা হতো গির্জার অবস্থানের বিরোধী ও সাংঘর্ষিক। এটি ছিল এমন বিষয়, তৎকালে গির্জার পক্ষে যা মেনে নেওয়া বা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এটি গির্জার যাজকদেরকে গির্জা ও গির্জার শিক্ষাদীক্ষা, ইনকুইজিশন ট্রাইব্যুনাল ও সেখানকার গণহত্যা, নরহত্যা, পাশবিক অত্যাচার, গির্জার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বা পরিচালিত প্রহসনমূলক বিচার ইত্যাদি সকল কিছুর যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে খতম করতে ও কষ্ট দিতে উদ্বুদ্ধ করে। এসব জনগণের অগোচরে থাকেনি কিছুই
এমন পরিবেশে আধুনিক গণতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই কারণে গণতন্ত্রকে গির্জার শিক্ষা ও ধর্মের নামে প্রচলিত প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারে ক্রুদ্ধ দেখা যায়। গির্জার শিক্ষাদীক্ষা ও আল্লাহর নামে মানুষের ওপর গির্জা যা চাপিয়েছে সবকিছুর প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে যায়। এই প্রতিহিংসার কারণ হলো, গির্জা মনে করত আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কথা বলার অধিকার একমাত্র তারই রয়েছে, এই অধিকার আর কারও নেই। এরপর গণতন্ত্র গির্জার পোপদের থেকে সার্বভৌমত্বের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার দিকে মনোযোগ দেয়। যেন জনগণের সার্বভৌমত্বের নীতি বাস্তবায়নের নামে গির্জার পোপদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তা পুরোপুরি সঁপে দেওয়া যায় প্রতিনিধিত্বকারী আইনসভার পোপদের অধিকারে। ফলে সার্বভৌম কর্তৃত্ব চলে যায় এক মাখলুক থেকে ভিন্ন মাখলুকের কাছে। এক সৃষ্টির প্রভুত্ব থেকে ভিন্ন সৃষ্টির প্রভুত্বে। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের এই সৃষ্টির প্রভুত্ব এসেছে ধর্ম ও গির্জা থেকে দূরে, নামসর্বস্ব প্রজাতন্ত্রের নামে!

গণতন্ত্রের সাথে জড়িয়ে আছে উদারতাবাদ (লিবারেলিজম)। বলপ্রয়োগ করে কারো কোনো কাজে বাধা দেওয়ার অধিকার দেয় না গণতন্ত্র। কোন কাজে বাধা দেওয়া হবে বা হবে না, শাস্তি দেওয়া বা না দেওয়াও পাশ হবে ভোটের মাধ্যমে। অর্থাৎ জনগন যদি মদকে বৈধতা দিতে চায় হবে তা বৈধ, যদি পতিতাবৃত্তির পক্ষে আইন তৈরি করতে চায়-তাও বৈধ। সাথে অবাধ বাকস্বাধীনতার অধিকার দেয় গণতন্ত্র। কেউ যদি আল্লহ ও রসূল ﷺ কে অবমাননা ও কটুক্তি করে, কেউ যদি মুরতাদ হয়ে যায় তা গণতন্ত্র অনুযায়ী কোনো অপরাধ নয়। তবে এসব স্বাধীনতা সমাজের প্রভাবশালী ও শাসকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ নেই।

আলি হাসান উসামা তার ওয়েবসাইটে লেখেন,

‹‹দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.) পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যখন নিজেদের অধীনস্থ মুসলিম দেশগুলো ত্যাগ করছিল, তখন তারা খুব ভালোভাবেই খেয়াল রেখেছে যে, তাদের চলে যাওয়ার পরও যাতে কোনো ভূখণ্ডে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়ত বাস্তবায়িত হতে না পারে। তাই অধিকাংশ মুসলিম দেশে গণতন্ত্র চালু করা হয় এবং এ বিষয়টি আবশ্যক করে দেওয়া হয় যে, কোনো মুসলিম দেশে শরয়ি শাসনব্যবস্থা চালু করা যাবে না। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘের চার্টারকে জীবনব্যবস্থা (ধর্ম) হিসেবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। সরকারগুলো এসব আইন-কানুন গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবায়ন করছে। রাষ্ট্রের পুলিশবাহিনী তা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে।››

গণতন্ত্র একটি দীন

দ্বীন হলো যা মানুষ ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে। ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লহ) বলেন, দীন হলো আনুগত্য।

দীন কেবল ইবাদতের সমষ্টি নয়। এটি হলো পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

আল্লহ তাআলা বলেন,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ...ۖ

আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। (সূরা মায়েদা : ৪৯)

আদি বিন হাতিম থেকে বর্ণিত, তিনি যখন খ্রিষ্টান অবস্থায় রসূল ﷺ এর নিকট আগমন করেন তাকে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে শোনেন,

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

(তারা তাদের পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। করেছে)। তিনি বলেন, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না। অর্থাৎ ইবাদত, দুআ, সেজদা ও রুকুর উদ্দেশ্য বানিয়ে তাদের ইবাদত করি না। তার ধারণা ছিল, ইবাদত কেবল এসব অর্থেই সীমাবদ্ধ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন, আল্লাহ যা হালাল করেন, তা কি তারা হারাম করে দেয় না, তারপর তোমরাও তা হারাম করে নাও? তারা হালাল করে দেয় না যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তারপর তোমরাও তা হালাল করে নাও?
আদি বলেন, আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি ﷺ বলেন, এটিই তাদের ইবাদত।
অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মগুরুর সামনে রুকু-সিজদা করতো না, বরং তারা যা বৈধ বলতো সেগুলো বৈধ বলে মেনে নিতো যদি তা অবৈধ হয়, আবার বৈধকে অবৈধ ঘোষণা করলে তাও মেনে নিতো। আর সেটাকে উদ্দেশ্য করেই আল্লহ বলেছেন তারা তো তাদেরকেই রব্ব হিসেবে মেনে নিয়েছে। আর রসূল ﷺ এটিকেই তাদের ইবাদত বলেছেন।
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেও মানুষকে সর্বক্ষমতার অধিকারী ও বিধানপ্রণেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, সেই বিধানের আনুগত্য করার জন্য নাগরিকদের বাধ্য করা হয়।

সাইয়্যেদ কুতুব (রহিমাহুল্লহ) বলেন,
আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে জমিনের সকল (মানবসৃষ্ট) জীবনব্যবস্থাকেই মানুষ রব হিসেবে মেনে নেয়। গণতন্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তেও এটি পাওয়া যায়। যেমন পাওয়া যায় স্বৈরতন্ত্রের সর্বনিম্ন প্রকৃতিতে।
গণতন্ত্রকে কি দীন বলা যায় না কি যায় না সেটি আরো স্পষ্ট হবে এর মূলনীতিসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তাই এ প্রসঙ্গে আলোচনা আনা হবে।

গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলনীতিসমূহ

প্রথম ভিত্তি-জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস :
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একদল জনপ্রতিনিধি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। বিধানপ্রণয়ন, বৈধতাকরণ ও অবৈধকরণের দিক থেকে ইবাদত, উপাসনা ও আনুগত্যের মালিক হলো জনগণ।
আল্লহ তাআলা বলেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত যেন না করা হয়। (সূরা ইউসুফ : ৪০)

وما اختلفتم فيه من شيئ فحكمه إلى الله

আর তোমরা এ ব্যাপারে যেকোনো মতভেদ করো, ফয়সালা দেবেন একমাত্র আল্লাহ! (সুরা শুরা : ১০)
أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে? আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর? (সুরা মায়েদা : ৫০)

দ্বিতীয় ভিত্তি-ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা :
গণতন্ত্রের ছায়ায় যে কেউ যেকোনো ধর্ম বা মতবাদ গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে, মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।
কোনো মুসলিম যদি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায় তবে শরীয়তে তার শাস্তি হলো তাকে হত্যা করা হবে। তার সাথে কোনো নিরাপত্তা চুক্তি শুদ্ধ হয় না।
সহীহ বুখারি ও অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি দীন পরিবর্তন করবে তোমরা তাকে হত্যা করো।
অগ্নি উপাসক ও আহলে কিতাবদের ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম হলো-
১. ইসলাম গ্রহণ, এটি সর্বপ্রথম নির্দেশ
২. হীন অবস্থায় জিজিয়া কর আদায় (যদি ইসলাম গ্রহণ না করে)

৩. হত্যা ও লড়াই

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লক্ষণীয় যে, ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হওয়াকে নিরাপত্তা দেওয়া হলেও, গণতন্ত্র নামক ধর্ম বা মতবাদ ত্যাগ করাকে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হয় না, এসবই গণতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

তৃতীয় ভিত্তি-সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা :
গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে। যে আইনে বিচার হবে সে আইনপ্রণেতা আইনবিভাগ।

আল্লহ তাআলা বলেন,

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেন, তার ফয়সালা তো আল্লাহরই কাছে। (সুরা শুরা : ১০)

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন গ্রন্থে (১/৫০) বলেন, তাগুত হলো প্রত্যেক গাইরুল্লাহ—যার ব্যাপারে মানুষ সীমালঙ্ঘন করে, তার উপাসনা, অনুসরণ বা আনুগত্য যা-ই করা হোক। প্রত্যেক জাতির তাগুত হলো ওই ব্যক্তি বা ওই শাসনব্যবস্থা, আল্লাহ ও রাসুলকে ত্যাগ করে তারা যার নিকট বিচার কামনা করে।

চতুর্থ ভিত্তি-বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা :
এ ব্যাপারে আলোচনা গত হয়েছে যে, গণতন্ত্র এমন এক আবরণ যার ছায়াতলে মুরতাদ হওয়া কিংবা আল্লহ ও রসূলের ﷺ শানে অবমাননামূলক কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বা প্রভাবশালীদের মতবাদ মতাদর্শের বিরুদ্ধে এই বাকস্বাধীনতা প্রয়োগ করা যাবে না।
অথচ যে বাকস্বাধীনতা গনতান্ত্রিকদের কাছে পছন্দনীয় সেটাই ইসলামে রিদ্দাহ (ধর্ম থেকে বের হয়ে যাওয়া)।
পঞ্চম ভিত্তি-ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ :
গণতান্ত্রিকদের মতে, রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্ম বিচ্ছিন্ন। ধর্ম ধর্মের জায়গায়, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতি তার জায়গায়। ধর্ম কেবল ইবাদতখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ ইসলাম এসেছে

পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে। যেখানে সুযোগ নেই কিছু অংশকে গ্রহণ ও কিছু অংশকে ত্যাগ করার।

ষষ্ঠ ভিত্তি-অবাধ বাকস্বাধীনতা।

সপ্তম ভিত্তি-একাধিক রাজনৈতিক দল :
নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন হয় একাধিক রাজনৈতিক দল। যারা তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংসদে বসায়। অথচ এই বহুদলীয় ব্যবস্থা ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। ইসলামের নির্দেশ জামাআহবদ্ধ থাকার। একই শরীয়তের আইন বাস্তবায়নে কেনইবা ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি হবে? অথচ দেখা যায় বহুদলীয় ব্যবস্থায় ভ্রান্ত ও বিপথগামী দলগুলোকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয় ও প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ দেওয়া হয়।

রসূল ﷺ বলেন,
যে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমা লঙ্ঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মতো, যারা লটারির মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল ওপরতলায় আর কেউ নিচতলায় (পানির ব্যবস্থা ছিল ওপরতলায়)। কাজেই নিচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহকালে ওপরতলার লোকদের ডিঙিয়ে যেত। তখন নিচতলার লোকেরা বলল, ওপরতলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নিই (তবে ভালো হয়)। এমতাবস্থায় তারা যদি এদেরকে আপন মর্জির ওপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে (বিরত রাখে) তবে তারা এবং সকলেই রক্ষা পাবে।

এখনো যারা নিচের অংশে রয়েছে, তারা বর্তমানে গণতন্ত্রের দিকে আহ্বানকারীর ভূমিকা পালন করছে। তারা চায় নিজেদের সংশয়, প্রবৃত্তি ও বাতিল মতাদর্শ দ্বারা জাহাজ ফুটো করে দিতে। যেন গণতন্ত্র তাদেরকে যে স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিয়েছে, তার ধোয়া তুলে নিজেদেরসহ সকল আরোহীকে নিয়ে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে। তাই পূর্ণ ঔদ্ধত্য নিয়ে গণতন্ত্র বলে, দলগুলোকে তাদের যা ইচ্ছা করতে দাও। তাদেরকে তাদের যা খুশি অনিষ্ঠ, ফিতনা, কুফর ও শিরকের মাধ্যমে সমাজ ধ্বংস করার প্রক্রিয়া চালাতে দাও। তারা স্বাধীন। তাদের স্বাধীনতা পবিত্র। কারও অধিকার নেই তাদেরকে বাধা দেওয়ার বা তাদের পবিত্র স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার। এর পরিণতি যা-ই হোক না কেন।

অষ্টম ভিত্তি-সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত :
গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
আল্লহ তাআলা বলেন,
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا وإن هم إلا يخرصون

যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করেন, তারা আল্লাহর পথ থেকে আপনাকে বিপথে নিয়ে যাবে, তারা তো কেবল অনুমানের অনুসরণ করে, আর তারা অনুমানভিত্তিক কথা বলে। (সূরা আনআম ১১৬)

সহিহ হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,
আমাকে যেমন সত্যায়ন করা হয়েছে, কোনো নবিকে তেমন সত্যায়ন করা হয়নি। এমন নবিও বিগত হয়েছেন, যাকে তার উম্মতের কেউ সত্যায়ন করেনি; কেবল একজন ব্যতীত। (সহিহ মুসলিম)
সেক্ষেত্রে যদি গণতন্ত্র অনুসারে বিবেচনা করা হয় তাহলে তো সেই নবীগণ তাদের উম্মতের মাঝে কখনোই মনোনীত হতেন না!

নবম ভিত্তি-ভোট ও নির্বাচন প্রক্রিয়া :
অধিকাংশের ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনপ্রতিনিধি গঠণ দ্বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রকার্য পরিচালিত হয়।
অথচ ইসলাম মানেই আত্মসমর্পণ, যে সকল বিধান এসেছে তা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া, এজন্য মেনে নেওয়া নয় যে তা অধিকাংশের সিদ্ধান্ত বা ভোটে জয়যুক্ত-বরং তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত বলেই মেনে নেওয়া।

এখানে লক্ষণীয় যে, ভোটপদ্ধতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে ভোটদাতারা চাইলে আল্লহর আইন প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম। যদি তারা সক্ষম নাই হতো, তাহলে তো ভোট নামক আয়োজনের প্রয়োজন ছিলো না। তাহলে ভোট ব্যতীতই আল্লহর আইন ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হতো।

ভোট ব্যবস্থা ও অধিকাংশের মতামত যদি শাসনভার নির্বাচনের মাপকাঠি হতো তাহলে আবু বকর রদ্বিআল্লহ আনহুর যুগে শাসনভার গ্রহণ করতো মুসায়লামাতুল কাযযাব। কেননা সে সময়ে তার অনুসারী ছিলো অনেক, মুরতাদ হয়ে অনেকে তার দলে যোগদান করেছিলো।

যদি ভোট পদ্ধতির আয়োজন করে খলিফা নির্বাচন করা হতো তাহলে দেশ শাসন করতো মুসায়লামা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এরকম অনেক হক্ক বাতিলের দ্বন্দ্ব দেখা যায় যেখানে জয়যুক্ত হয়েছে হক্কপন্থীরাই।

লক্ষণীয় যে, ভোটপ্রদান হলো সাক্ষ্যদান। কোনো ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া মানে তার আকিদা ও দীনকেও ভোট দেওয়া। মুসলিম শাসক নির্বাচনের জন্য ভোটপ্রদানকারীদের ক্ষেত্রে ইসলামের শর্ত হলো তাদেরকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ ও দীনদার হতে হবে। কেননা তারা হলো সাক্ষ্যদাতা। আল্লহ তাআলা বলেন,

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষ্য দেবে। (সূরা ত্বলাক ২)

কুরআন ও সুন্নাহর বহু জায়গায় ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর কথা আছে। অথচ ভোটপ্রদান দ্বারা একজন আলিম ও একজন জাহিল, একজন মুসলিম ও একজন কাফিরের সাক্ষ্য সমান হয়ে যায়।

একইসাথে, যাকে ভোট দেওয়া হচ্ছে তার যোগ্যতাও বিবেচ্য, কোনো অযোগ্য ব্যক্তি শরীয়াহর মাপকাঠিতে মনোনয়ন পাবারই যোগ্য নয়, সেখানে দেখা যায় অধিকাংশ অযোগ্য ব্যক্তিই মনোনয়নের দাবিদার ও মনোনয়নপ্রাপ্ত হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ায়।

দশম ভিত্তি-সাম্যের মূলনীতি :

এটা বোঝায় যে দায়-দায়িত্ব ও হকের দিক থেকে সমাজের সকল মানুষ সমান। তাদের আকিদা, দীন, চাল-চলন যেমনই হোক না কেন।

আল্লহ তাআলা বলেছেন:

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ . مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

তবে কি আমরা মুসলিমদেরকে (অনুগতদেরকে) অপরাধীদের সমান গণ্য করব? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? (সুরা কালাম : ৩৫-৩৬)

একজন মুসলিম ও একজন কাফির ইসলামে কখনোই সমান নয়, তাদের সুযোগ সুবিধাও সমান নয়। আবার নারী পুরুষভেদে ইসলাম আরোপ করেছে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব ও সুবিধা।
সৌদির স্থায়ী ফতোয়াবোর্ড আল-লাজনাতুদ দায়িমার ফতোয়ায় এসেছে,
"ইহুদি-নাসারাসহ সকল কাফের আর মুসলমানদের মধ্যে যারা দেশ ছাড়া অন্য কিছুতে পার্থক্য করে না, এবং উভয়ের জন্য একই বিধান নির্ধারণ করে, তারা কাফের।"
এই কুফরিটিই গণতন্ত্রের নীতিসমূহে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর সেটিই গণতান্ত্রিকগণ বাস্তবায়ন করছেন।

একাদশ ভিত্তি-সম্পদের প্রকৃত মালিকানা :
গণতন্ত্র দাবি করে, সম্পদের প্রকৃত মালিকানা জনগণের। এটা ইঙ্গিত করে, যে যেভাবে ইচ্ছে উপার্জন ও খরচ করতে পারে। এমনকি সেটা আল্লহর আইনে নিষিদ্ধ হলেও, সেটা যদি গণতান্ত্রিক আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ কোনো মাধ্যম না হয় তাহলে তা বৈধ।
অথচ আল্লহ সুস্পষ্টভাবে হারামের সীমারেখা দিয়ে দিয়েছেন, যাকে রদ করার অধিকার কোনো মানুষের নেই।

এসব ভিত্তি থেকে বোঝা যায়, গণতন্ত্র নিজেকে একটি দীন বা ধর্ম হিসেবেই প্রকাশ করেছে। যার প্রতিটি ভিত্তি দীন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

গণতন্ত্র কেন কুফরি

আল্লহ তাআলা বলেছেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (ইউসুফ : ৪০)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে? (সূরা মায়িদাহ ৫০)

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم
এখন যারা গোমরাহকারী তাগুতদের মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। (সূরা বাকারা ২৫৬)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون َ
আল্লাহ ব্যতীত কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' (ইউসুফ ৪০)

গণতন্ত্র কেন কুফরি নিচের আলোচনা থেকে বোঝা যায় (লেখাটি মাসিক আত তাহরীকে প্রকাশিত ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হাফীয-এর আর্টিকেল থেকে ঈষৎ পরিমার্জিত ও সংযোজিত) :

১. গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা স্পষ্ট শির্ক। পক্ষান্তরে ইসলামের খিলাফতি রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত।

২. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা হয়। পক্ষান্তরে খিলাফতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থ হলো আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা।

৩. গণতন্ত্রের মূল দর্শন হলো মানুষকে সন্তুষ্ট করা যেভাবেই হোক। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে মানুষের সেবা করা।

৪. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে এতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা স্বীকৃত। কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে ধর্মের কোন প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হয় না। এর রাজনীতি ধর্ম-বিবর্জিত। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতে ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় মানুষের সার্বিক জীবনে ধর্মের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে। রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ধর্মের নীতিমালা অনুসরণ করে চলে।

৫. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ যেহেতু সকল ক্ষমতার মালিক, তাই ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, এমনকি বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সাব্যস্ত করার অধিকার জনগণের।

এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে যেকোন ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্র প্রধান হতে পারে, তেমনি ইচ্ছামত যেকোনো আইন রচনা করতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহকেই যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মানা হয় সেহেতু ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে আইন প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতানুসরণ করার নীতিকে ইসলাম এড়িয়ে চলে। কেননা আল্লাহ অধিকাংশের মতানুসরণকে নিরুৎসাহিত করেছেন। (সূরা আন‘আম ১১৬)।

৬. গণতন্ত্রে রাজনীতি চলে বহুদলীয় পদ্ধতিতে। একদল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনা করে। ভোটে পরাজিত দল বা দলসমূহ বিরোধী দলে থেকে সরকারের সমালোচনা করে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রে বহু দল, মত ও ধর্মের উপস্থিতি থাকলেও রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থাপনা স্বীকৃত নয়। কেননা তাতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা উম্মাহর দায়িত্বশীল বা খাদেম হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি বিশেষ কোনো দলের লোক হন না।

৭. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান বা শাসক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সার্বিক যোগ্যতা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতে রাষ্ট্রপ্রধান যতদিন যোগ্যতা ও সক্ষমতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন ততদিন ঐ দায়িত্বে বহাল থাকবেন। যোগ্যতা হারালে বা অক্ষম প্রমাণিত হলে ঐ মুহূর্তেই বিদায় নিবেন বা বিদায় করা হবে। তাঁকে শাসন ক্ষমতায় বসানো বা প্রয়োজনে বিদায় করা শরীআতে আবশ্যক।

৮. গণতন্ত্রে নেতাকে পদপ্রার্থী হতে হয়। নিজের যোগ্যতা ও গুণাবলির ঘোষণা দিয়ে তাকে পদের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হয়। অপরপক্ষে ইসলামে কেউ নেতৃত্ব বা পদ চাইলেই তিনি নেতৃত্বদানের অযোগ্য বিবেচিত হন, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় না।

৯. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এক রকম নয়। অথচ এই শূরা ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সাদৃশ্য প্রমাণের জন্য সবচেয়ে বেশি যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও মান এবং তাদের কার্যপ্রণালী আর ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও মান এবং কার্যপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করলেই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে আসমান-যমীন ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে।

গণতন্ত্রে জ্ঞানী-মূর্খ, বোকা-বুদ্ধিমান, সৎ-অসৎ সব ধরনের মানুষের শূরা সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সব ধরনের মানুষের মতকে গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মুর্খ বা বোকার দল বেশী হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তটি ভুল হোক বা সঠিক হোক।

পক্ষান্তরে উম্মতের বাছাইকৃত সেরা জ্ঞানী-গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা গঠিত হয় এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত নয়। যদি ১ জন সদস্যের পরামর্শ বা মত দলীল-প্রমাণ ও বিবেক-বিবেচনার অনুকূলে হয়, তাহলে সেটাই গ্রহণ করা হয়। (বিস্তারিত দেখুন-'গণতন্ত্র ও শূরা কি অভিন্ন' শীর্ষক আলোচনায়)

১০. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেকোনো আইন তৈরী করতে পারে। তারা হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো বলে বিল পাশ করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরায় এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত বিধানের বিষয়ে পুণর্বিবেচনা বা মতামত প্রদানেরও কোন সুযোগ নেই।

১১. সংসদের কোনো অধিবেশন আল্লাহর আয়াতসমূহ ও বিধানাবলির ব্যাপারে সমালোচনা, অপবাদ আরোপ, ঠাট্টা-মশকরা করা ও অস্বীকার করা থেকে মুক্ত থাকে না। এবং এ কাজগুলো করা হয়ে থাকে ভোট ও মতামতপ্রদান, নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে। সংসদীয় প্রতিনিধি যতই উত্তম নিয়ত করুক না কেন, যখন সে সংসদে যোগ দেয় তখন জাতির এই কুফরিতে শরিক হওয়া ব্যতীত আর কোনো পথ বা রাস্তা বাকি থাকে না। যদিও সে কেবল সংসদে বসতে হয় বলেই বসে। কিন্তু কুফরির মজলিসে বসা ও দীনের সাথে ঠাট্টা করা, উপহাস করা, ইচ্ছায়ই হোক বা অনিচ্ছায়, সেটি কুফরিই। অবশ্যই এটি রিজা বিল কুফর তথা কুফরির ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকার নামান্তর।

আল্লহ বলেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَٰفِقِينَ وَالْكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ দোজখের মাঝে মুনাফিক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন। (সূরা নিসা : ১৪১)

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেন, "ইসলাম ও গণতন্ত্র দুটি বিপরীতমুখী ব্যবস্থা। যা কখনো এক হবার নয়। একটি আল্লাহর উপর ঈমান ও আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা, অপরটি তাগূতের (আল্লাহ বিরোধী অনুশাসন) প্রতি ঈমান ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার উপর নির্ভরশীল।"

পরিভাষা হিসেবে 'গণতন্ত্র' প্রয়োগ

অনেকে দাবি করে থাকে যে তারা কেবল পরিভাষা হিসেবেই গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। এর দ্বারা গণতান্ত্রিকরা যেসকল উদ্দেশ্য নেয় তা তারা নেয় না। তারা কেবল সেই উদ্দেশ্যই নেয়, যে দিকগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আর যেসকল দিকগুলো সাংঘর্ষিক সেগুলোকে বাদ দেয় কিংবা ইসলামাইজেশন করার চেষ্টা করে। এভাবে তারা ইসলামিক গণতন্ত্র নামে এক আজগুবি পরিভাষা পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছে। এখানে লক্ষণীয় কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি-

১. পূর্বে গণতন্ত্রের ভিত্তি সংক্রান্ত আলোচনা গত হয়েছে। সেখান থেকে স্পষ্ট হয় গণতন্ত্র কোন কোন মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র অস্তিত্বহীন। একটা সিস্টেমের কেবল নামটুকু নিয়ে নিজের মতো করে অন্য একটা সিস্টেম গঠন করা যায় না। তাহলে সেটাকে একটি নতুন নাম দিতে হবে, অন্য একটি স্বতন্ত্র সিস্টেমের আদলে নাম দিলে গ্রহণযোগ্য হবে না। ইসলামাইজেশন করে কতিপয় মুসলিম গোষ্ঠী যে গণতন্ত্রের দাবি জানায় সেটাকে কখনোই গণতন্ত্রের ধজ্জাধারীরা গণতন্ত্র বলে মেনে নেবে না। তারা বলবে,

এটা আবার কেমন গণতন্ত্র, এই গণতন্ত্র আমরা চিনি না, মানি না। এই গণতন্ত্র আমাদের মূলনীতিগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কাজেই এটা কোনো সুষ্ঠু গণতন্ত্র নয়।

২. কেউ যদি নির্বাচনি প্রচারণায় গণতন্ত্র বাস্তবায়নের দাবি জানায় কিন্তু মনে মনে শরীয়াহ কায়েমের নিয়ত রেখেই নির্বাচনে যায়, এটা কি ধোঁকাবাজি নয়? অথচ শয়ীয়ত কোনো ধোঁকাবাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়নি, প্রতারণার আশ্রয়ে ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করেনি। কাজেই কেউ কি শরীয়াহ কায়েম করতে চায় নাকি গণতন্ত্র-এটি স্পষ্ট করেই তাকে নির্বাচনে আসতে হবে। যদি কেউ স্পষ্টভাষায় দাবি জানায় নির্বাচিত হয়ে সে শরীয়াহ কায়েম করবে-তাকে কি কখনো পশ্চিমাশক্তি ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা নির্বাচিত হতে দেবে? বা নির্বাচিত হলেও ক্ষমতা হস্তান্তর করবে? যেমনটি আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। এখন পর্যন্ত দুনিয়ার কোথাও কেউ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় গিয়ে শরীয়াহ আইন পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন করেছে এমন উদাহরণ দেখা যায় না। কারণ এটা অসম্ভব, কল্পনাপ্রসূত।

৩. ধরে নিলাম, কেউ গণতন্ত্র বলতে বুঝিয়েছে সে কেবল সেই আইনগুলোই গ্রহণ করবে যেগুলো শরীয়তেও বৈধ এবং অধিকাংশ জনগণের/জনপ্রতিনিধির ভোট পেয়েছে। তাহলে সেই আইনকে কেন গ্রহণ করা হলো-শরীয়তে নির্দেশ এসেছে সেজন্য নাকি অধিকাংশ মতামত দিয়েছে সেজন্য? আল্লহর আইন আল্লহর নির্দেশেই বাস্তবায়ন করার কথা, কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধির মতামতের ভিত্তিতে নয়।

৪. ইসলামি শরীয়ত বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যদিও সেগুলো বাহ্যিক অর্থে শুদ্ধ ও ভালো। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন প্রবৃদ্ধি পূজারিরা এর মাধ্যমে নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করতে না পারে, বাহ্যিক অর্থ ব্যবহার না করে ভেতরকার বাতিল অর্থের আশ্রয় নিতে না পারে।
যেমন, راعنا (আমাদের প্রতি লক্ষ করুন) শব্দটি সাহাবারা ব্যবহার করতেন রসূল ﷺ এর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। অভিশপ্ত ইহুদিরা একে গালি হিসেবে লুফে নেয়। হিব্রুভাষায় এর অর্থ দুষ্ট/বোকা। আল্লহ তখন আয়াত নাযিল করলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

হে মুমিনগণ, তোমরা ‘রা‘ইনা’ বলো না; বরং বলো, ‘উনজুরনা’ ও শোনো। কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সূরা বাকারা ১০৪)

বনী ইসরাইলকে আল্লহ যখন জেরুজালেমে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করালেন তখন তাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন, হিত্তুতুন বলতে বলতে প্রবেশ করার, যার অর্থ ক্ষমা চাই। কিন্তু তারা তাকে বিকৃত করে বলেছিলো, হিনততুন, যার অর্থ-গমের দানা। (রেফারেন্স আয়াত: সূরা বাকারা ৫৮-৫৯)

এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা আঙুরকে কারাম বলো না, ইনাব বলো। (সহীহ মুসলিম)
তিনি আরও বলেন, কেউ যেন আঙুরকে কারাম না বলে, কারণ কারাম তো মুমিন ব্যক্তি। (কারাম অর্থ মহত্ত্ব/মহান)। (সহীহ মুসলিম)

নিষেধাজ্ঞার কারণ বলা হয়েছে এটি মুমিন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। হয়তো কোনো মুনাফিক কারামকে গালি দেবে, মুমিনরা মনে করবে সে আঙুর উদ্দেশ্য নিচ্ছে, অথচ সে কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছে। মুসলিমকে গালি দেওয়া মানে ইসলামকে অপমান করা।
অন্য হাদিসে এসেছে,
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যেন না বলে তোমার রবকে খাবার দাও, তোমার রবকে সন্তুষ্ট করো, তোমার রবকে পানি পান করাও। কোনো গোলাম যেন তার মুনিবকে না বলে আমার রব, বরং বলবে, আমার সাইয়েদ, আমার মাওলা। আর কোনো মালিক যেন না বলে আমার দাস, আবদ। বরং বলে, আমার গোলাম।

যেখানে বাহ্যিক ভালো অর্থের শব্দগুলোকেও মাকরুহ করা হয়েছে কেবলমাত্র তার দ্বারা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল প্রয়োগের দ্বার বন্ধ করতে, সেখানে বাহ্যিকভাবেই যার অর্থ ত্রুটিযুক্ত তাকে কি ভালো অর্থে প্রয়োগ করা যায়? যার সৃষ্টি হয়েছে কুফরি মতবাদের উপর তাকে ইসলাম কায়েমের হাতিয়ার বানানো সম্ভব?

৫. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ শপথ গ্রহণ করেন কুফরি সংবিধান ব্যবস্থার উপর।
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
يَمِينُكَ على ما يُصَدِّقُكَ عليه صاحِبُكَ
তোমার কসম ওই উদ্দেশ্যের জন্য ধরে নেওয়া হবে, যে উদ্দেশ্যের ওপর তোমার সাথি (যার সামনে শপথ করা হয়েছে) তোমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। (সহীহ মুসলিম)

কাজেই কেউ যদি বলে আমি যার উপর শপথ করেছি আমার অন্তরের নিয়ত সেটা ছিলো না, বরং আমি তো অন্য নিয়ত রেখেছি। তবে কি তা ধর্তব্য হবে?

গণতন্ত্র ও ইসলামি শূরাব্যবস্থা কি অভিন্ন

এ বিষয়ে পয়েন্ট আকারে আলোচনা করা হবে–

১. শূরাব্যবস্থা কেবল সেসকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে ইজতিহাদের সুযোগ আছে, কুরআন সুন্নাহ দ্বারা স্পষ্ট রায় নেই। কিন্তু গণতন্ত্র শুধু সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগের অবকাশ নেই-যেসব ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর হুকুম নেই, বরং বিগত আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি গণতন্ত্র শরীয়তের অকাট্য বিষয়গুলোতেও হস্তক্ষেপ করে।

২. শূরাব্যবস্থা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ (আহলুল হাল ওয়াল আকদ বলা হয়, মুসলিম খিলাফাহ রাষ্ট্রের শাসন ও আমির নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী একদল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ—যারা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ন্যায়পরায়ণতা, রাজনৈতিক দক্ষতা ইত্যাদির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে উপদেষ্টার ভূমিকা পালন
করেন) এবং মুজতাহিদদের অধীনে থাকে। যারা কুরআন সুন্নাহর গভীর জ্ঞান রাখেন। সর্বস্তরের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে চলে না। কিন্তু গণতন্ত্র জ্ঞানী বা মূর্খ-সর্বস্তরের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত সিস্টেম। শূরাব্যবস্থা কখনো অধিকাংশের মতামতনির্ভর নয়, শুধুমাত্র যোগ্য উপযুক্ত আহলে ইলমদের দ্বারাই পরিচালিত হবে।

৩. শূরার সিদ্ধান্ত হয় কুরআন সুন্নাহর উপর ইজতিহাদ দ্বারা, তাতে জনগণের মতামত থাকুক বা না থাকুক। এখানে কখনোই অধিকাংশের মতামত ধর্তব্য নয়। কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় বা মত গ্রহণ করা হ’তে পারে, কখনো সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতও গ্রহণ করা হতে পারে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের চাইতে সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতামত বেশি কল্যাণকর মনে হয়। এমনকি ১০০ জন শূরা সদস্যদের মধ্যে ১ জন সদস্যের পরামর্শ বা মত যদি দলিল-প্রমাণ ও বিবেক-বিবেচনার অনুকূলে হয়, তাহলে সেটাই গ্রহণ করা হয়।

৪. শূরাব্যবস্থায় কাউকে আমির হিসেবে নির্বাচন করার জন্য যে কয়েকজনকে প্রস্তাবিত করা হয় তারা সবাই আমির হিসেবে মনোনয়নের যোগ্যতাসম্পন্ন। এখানে কখনোই একজন জ্ঞানীর

সাথে একজন মূর্খের তুলনা হয় না, একজন যোগ্যতাসম্পন্নের সাথে অযোগ্যের তুলনা হয় না। বরং একাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন (শরঈ দৃষ্টিতে) এর মধ্য থেকে অধিক হকদারকে বাছাই করা হয়। ভোট ব্যবস্থায় দেখা যায় যার ইচ্ছে সেই মনোনয়নপত্র কিনতে পারে, দল কর্তৃক মনোনয়নের জন্য নির্বাচিত হতে পারে, এমনকি ইসলামি গণতান্ত্রিক দল বলে দাবিদার দলগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায়, শরীয়তের মানদন্ডে মনোনয়ন পাবার দাবিদার নয় এমন ব্যক্তিও মনোনয়ন পেয়ে যায়।

৫. গণতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য দিক-ভোট, আর ভোটে নির্বাচিত হওয়ার জন্য নানা প্রচারণা, নিজের ও দলের গুণগান করতে হয়। লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় হয় প্রচারণার পেছনেই। অথচ শূরা ব্যবস্থায় যাকে মনোনীত করা হয় তাকে নিজের ঢাকঢোল পিটিয়ে নির্বাচিত হতে হয় না, প্রার্থীতা চেয়ে নিতে হয় না, যোগ্যতা জাহির করে বেড়ানো লাগে না। বরং পদ চেয়ে নেওয়াটাই তার জন্য নিষিদ্ধ, তাকে মনোনীত করবে শরীয়তের মানদন্ডে উত্তীর্ণ আলিমগণ।

৬. শূরাব্যবস্থা হলো রসূল ﷺ এর সাহাবিদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে খুলাফায় রশিদিনের যুগ থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচলিত একটি শরীয়াহসম্মত বিধান। যা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আমরা দেখতে পাই রসূল ﷺ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাঁর সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেছেন। কিন্তু দীনের ব্যাপারে অজ্ঞ কারো থেকে মতামত নিয়ে অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এমনটা আমরা দেখি না।
শূরাব্যবস্থা ইসলামের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণিত নীতি, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইসলামের কোনো পরিভাষা নয়, শরঈ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়, কুরআন সুন্নাহ দ্বারাও সাব্যস্ত নয় এবং সাহাবিদের আমলও নয় বরং কুফফারদের তৈরি একটি সিস্টেম যার দ্বারা মুসলিমদেরকেও আনুগত্যের শিকল পরিয়ে রাখা হয়েছে।

মাওলানা আব্দুল হক হক্কানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার নির্বাচন-পদ্ধতি থেকে ইসলামের নির্বাচন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা শুরা সদস্যদের এই অধিকার নেই তারা আল্লাহর নির্ধারিত করে দেওয়া কোনো বিধানকে উপেক্ষা করে ফয়সালা করবে। শুরার সবকিছুই শরিয়ত মোতাবেক হতে হবে। এ কারণেই যখন কোনো খলিফা আল্লাহর নির্ধারিত আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে, তখন তার বিরোধিতা করা নাজায়েজ, বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল। সুতরাং ভালো করে স্মরণ রাখতে হবে, ইসলাম সর্বকালের জন্য পরিপূর্ণ এক পবিত্র জীবনবিধানের নাম—যার সাথে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কোনো তুলনাই হতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বিবেক-বুদ্ধিহীন ভোট-পদ্ধতির মোকাবিলায় ইসলামি সুন্দরতম

যৌক্তিক শুরার মাধ্যমে খলিফা নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই অপূর্ণাঙ্গ, অযৌক্তিক, সুস্থ রুচি-বিবর্জিত গণতন্ত্রের ভোটাভুটির আশ্রয় নেওয়ার কোনো মানে হয় না।
(সূত্র : মাওলানা আব্দুল হক হক্কানি রাহিমাহুল্লাহ কৃত ফতোয়া হক্কানিয়া)

ইসলামি গণতন্ত্র : সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা

বর্তমানে মুসলিমদের একদল ইসলামি গণতন্ত্র নামে নতুন একটি পরিভাষা প্রবর্তন ও তার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা ও তা বাস্তবায়নের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন 'ইসলামি সমাজতন্ত্র' নামেও একটি পরিভাষার পক্ষে একদল মুসলিম যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলো।
ডঃ ইউসুফ আল-কারযাভী তাঁর Priorities of the Islamic Movement in the coming phase' গ্রন্থের 'The Movement and the Political Freedom and Democracy' শীর্ষক আলোচনায় গণতন্ত্রকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে জোর ওকালতি করেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও চিন্তাবিদ শাহ আব্দুল হান্নান তাঁর 'ইসলামের প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে গণতন্ত্র বিরোধী ওলামায়ে কেরামদেরকে যুগ চাহিদার প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রকে মেনে নেওয়ার আহবান জানান। তাঁর মতে, গণতন্ত্রকে গ্রহণ করলে পাশ্চাত্যে ইসলামের যে আগ্রাসী ও একনায়কত্ববাদী ভাবমূর্তি রয়েছে তা দূর হবে। বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে প্রভাব বিস্তার করে থাকা বিজাতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মতবাদ 'গণতন্ত্র' সম্পর্কেও একশ্রেণির ইসলামি চিন্তাবিদ অনুরূপ ভাষ্য প্রদান করে গণতন্ত্রকে মুসলিম বিশ্বে গ্রহণযোগ্য করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তারা বলছেন, শুধু সার্বভৌমত্বের প্রসঙ্গটি বাদ দিলে গণতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। 'মাসিক পৃথিবী' নভেম্বর **১৯৯১** সংখ্যায় বলা হয়েছে 'ইসলাম ও গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেটি বাদ দিলে গণতন্ত্রের বড় বড় ৪টি পয়েন্টের সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই'।

গণতন্ত্রের আংশিক কিছু বৈশিষ্ট্যকে ইসলামের বিভিন্ন দিকের সাথে তুলনা দিয়ে সাদৃশ্য বের করে, সেগুলোর পক্ষে যুক্তি-দলিল পেশ করে সেগুলোর ভিত্তিতে এক নতুন পরিভাষা হিসেবে ইসলামি গণতন্ত্রকে বৈধতাদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি কোনো সিস্টেমের আংশিক কিছু সাদৃশ্যকে পুঁজি করে তাকে ইসলামি রূপ দেওয়া যায় না, সেটাকে শরীয়াহসম্মত দাবি করা যায় না। এমন একটি জগাখিচুরি সিস্টেমের দাবি তারা জানাচ্ছে

যার ব্যাপারে মুফতি নিজামুদ্দিন শামজাজয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উলামায়ে কেরাম নির্বাচন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম
কায়েমের জন্য ৪৮ বছর ব্যয় করেছেন, আমি চ্যালেঞ্জ করে
বলতে পারি এ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ৪৮ হাজার বছর ব্যয়
করলেও ইসলাম কায়েম হবে না। (সূত্র : খুতবাতে শামজাজয়ি : ২০৩)

ইসলামি গণতন্ত্রের পক্ষে উত্থাপিত যুক্তি ও সেগুলোর খন্ডনগুলো পয়েন্ট আকারে তুলে ধরছি :

১. মানুষের রচিত বিধান কখনো কখনো ঐশী বিধানের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়, তাই বলে মানবরচিত বিধানকে ঐশী বিধানের সাথে তুলনা দিয়ে তাকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানানো সংকীর্ণতা ও পরাজিত মানসিকতা নয় তো কি? আমরা দেখি অনেকেই দাবি জানায়, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শরীয়তসম্মত, খুলাফায় রশিদিনদের যুগ এবং শূরাপদ্ধতি দ্বারা এর উদাহরণ টানা হয়। শূরা পদ্ধতির ব্যাপারে আলোচনা আগেই গত হয়েছে, অধিকাংশের মতামত যে সেখানে মূল বিষয় ছিলো না তা আলোচিত হয়েছে।

২. ইসলামি গণতান্ত্রিকদের দাবি, জনগণের শাসন দ্বারা তারা মূলত বোঝায়, স্বৈরশাসনের বিরোধিতা। এর দ্বারা আল্লহর সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা করা উদ্দেশ্য নয়।
যদি আল্লহর সার্বভৌমত্বকেই মেনে নেওয়া হয় তবে জনগণের শাসন দ্বারা উদ্দেশ্য কী? দুটি তো কখনোই একই সমান্তরালে চলতে পারে না। জনগণের শাসন দ্বারা গণতান্ত্রিকরা বোঝায়, জনগণের ভোটে নির্বাচন, জনগণের মতামতে আইন প্রণয়ন। যদি দাবি করা হয়, যেসব আইন শরীয়াহবিরোধী না সেগুলোকেই জনগণের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। তবে প্রশ্ন জাগে, সে আইনকে কিসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হলো-অধিকাংশের মতামত নাকি আল্লহর শরীয়াহ? যদি উত্তর হয় আল্লহর শরীয়াহ, তবে তাকে 'জনগণের শাসন' কীভাবে বলা হয়? 'স্বৈরশাসনের বিরোধিতা' করার জন্য আল্লহর ইনসাফপূর্ণ আইন ও শরীয়াহ এসেছে, সেখানে 'জনগণের শাসন' নামক পরিভাষারই বা কি প্রয়োজন হচ্ছে?
আমরা দেখি, জুলুমের বিরোধিতা করতে বলা হয়েছে। আমরা দেখি, খিলাফতকালে খলিফাদের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো দাবি-আপত্তি উত্থাপনে কার্পণ্য করেননি সাধারণ জনগণ। তবে তা গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মানদন্ড ছিলো শরীয়াহ ও দলিল, নাহয় যে কেউ

যেকোনো দাবি উপস্থাপন করে যেকোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঘটনা ঘটতো, এমনটা দেখা যায় না খুলাফায় রশিদিনের যুগে।
তাছাড়া উসমান রদ্বিআল্লহু আনহুর সময় দেখা যায়, কুফাবাসীর এক বড় অংশ ভুল প্ররোচনার শিকার হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তিনি ন্যায়বিচার করছেন না। এখানে একটি ভুল বোঝাবুঝির দরুন তাঁর মতো একজন সম্মানিত খলিফার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়, গণতন্ত্রের ছাঁচে ফেললে তো তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়াটাই গ্রহণযোগ্য ছিলো! গণতন্ত্রের ছাঁচে কুফাবাসীকে নিজেদের নির্বাচিত শাসক দ্বারা শাসন করতে দিলেই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়! কিন্তু খলিফারা নানা অভিযোগ খতিয়ে দেখে, তা নিরসনের চেষ্টা করে বিশাল ভূখন্ডের দায়িত্ব সামাল দিয়েছেন।

৩. জামাআতবদ্ধ থাকা ও অধিকাংশের মত অনুসরণের গুরুত্ব নিয়ে তাদের মতের পক্ষে নানা দলিল উপস্থিত করা হয়। দলিলগুলো স্ব স্ব স্থানে সঠিক হলেও গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ভুল। জামাআতবদ্ধ থাকা নিয়ে সামনে একটি আলোচনা আসবে। অধিকাশের মত অনুসরণের পক্ষে তাদের একটি দলিল হলো-
"তিন ধরনের মানুষের নামাজ তাদের মাথার ওপরে এক বিঘতও ওঠে না (এটি আল্লাহর কাছে নামাজ গ্রহণ না হওয়ার ইঙ্গিত)। এক, এমন ব্যক্তি, যে ইমামতি করে অথচ জামাআতের লোকেরা তাকে অপছন্দ করে।... "

এখানে ইমামকে অপছন্দ করার মাপকাঠি নিশ্চয়ই শরঈ মানদণ্ড। কোনো মূর্খ জনগণ যারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, কোনো কাফের মুশরিক মুরতাদ যদি এসে বলে অমুক ইমাম আমাদের পছন্দনীয় নয়, তবে কি তা গ্রহণযোগ্য? অথচ ভোটের ক্ষেত্রে একটি দেশের সকল ধর্ম ও মতবাদের মানুষদের অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সবারই সুযোগ আছে অংশগ্রহণের, সে যে ধর্মমতের হোক না কেন। নাকি ইসলামি গণতন্ত্র তাদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ থেকে বাধা দেবে?

মুফতিয়ে আজম পাকিস্তান মাওলানা মুফতি রশিদ আহমদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইসলামে পশ্চিমা গণতন্ত্রের কোনো স্থান নাই। কেননা এতে বিভিন্ন দলমতে বিভক্ত হওয়া আবশ্যক। অথচ আল কুরআনে এ বিষয়টাকে কঠোরভাবে নিষেধ
করা হয়েছে—

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ তাআলার রশ্মিকে আঁকড়ে ধরো, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না।

৪. ইসলামি গণতন্ত্রপন্থী দলগুলো যখন ক্ষমতালাভ করবে, তখন ভোটপদ্ধতির ধরণ কীরূপ হবে? বিধর্মী কিংবা সেক্যুলার দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি? অথচ শূরাব্যবস্থায় অমুসলিম বা মুরতাদ কারো জন্য অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। ভোটদানই বা কারা করতে পারবে? অমুসলিমদেরকে কি বিরত রাখা হবে? কেননা সাক্ষ্যদাতাকে ন্যায়পরায়ণ মুসলিম হতে হবে।

৫. সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যা মনে জাগে-ইসলামি গণতন্ত্র হুদুদ কায়েম করবে কীভাবে? (হুদুদ হলো হদ এর বহুবচন, যা বোঝায় কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত আল্লহর আইনসমূহ যা প্রয়োগ করা হবে নির্দিষ্ট অপরাধী জড়িতদের ক্ষেত্রে, যেমন যিনা ও ব্যভিচার, মদপান, চুরি ও অপবাদ প্রদানের শাস্তি)
তারা কি 'অধিকাংশের আইন ও সমর্থন' এর বিপক্ষে গিয়ে হুদুদ বাস্তবায়ন করবে? যেমন সমাজের অধিকাংশের মতে যিনা কোনো অপরাধ নয়, এক্ষেত্রে তাদের নীতি কী হবে? যদি তারা আল্লহর আইনকেই প্রাধান্য দেয়, এক্ষেত্রে জনগণ নিঃসন্দেহে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে, বলবে এমন স্বৈরশাসক আমরা চাই না যারা আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। এ আবার কেমন গণতন্ত্র যা মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে!

৬. এরপর যে প্রশ্ন জাগে, ইসলামি গণতন্ত্র কীভাবে জিজিয়া দিতে অস্বীকারকারী ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান কার্যকর করবে? গণতন্ত্র এমন একটি জাল যার রশি পশ্চিমাদের হাতে। তাদের নীতি বাস্তবায়ন ব্যতীত কোনো শাসককে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভূরাজনৈতিক সমীকরণ মোকাবেলা করে টিকে থাকতে তারা দেবে না। সেখানে অবাধ স্বাধীনতার নামধারী কাফের-মুরতাদ শ্রেণি, আল্লহ ও রসূল ﷺ কে কটুক্তিকারী পশ্চিমা মদদপুষ্ট শ্রেণিদের বিরুদ্ধে ইসলামি গণতন্ত্র কায়েমকারীদের অবস্থান কীরূপ হবে? এসকল অবমাননাকারী জিজিয়া দিয়েও কখনো তাদের নিরাপত্তা পাওয়ার দাবিদার হতে পারবে না।

৭. ইসলামি গণতন্ত্র নারীদের পর্দার বিধান কীরূপে আরোপ করবে? 'দেহ আমার সিদ্ধান্ত আমার' ভিত্তিতে নাকি সকল নারীর ক্ষেত্রেই আবৃত থাকার বিধান? যেহেতু একটি রাষ্ট্রে সকল নারী পর্দা করে না। অথচ সকল মুসলিম পুরুষের জন্যই দৃষ্টির হেফাজত আবশ্যক। বেপর্দা নারীদের বিভিন্ন জব সেক্টর দখল ও নানাভাবে নিজেদের উপস্থাপনের সময়ে এসে পুরুষদের দৃষ্টির হেফাজত চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। সেসব নারীদের উপর হিজাব চাপিয়ে দেওয়াটা তাদের কাছে 'স্বৈরশাসন' ব্যতীত আর কিইবা মনে হবে? যা গণতন্ত্রের সাথে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ফ্রিমিক্সিং প্রতিরোধ করতে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া বা আইন

প্রণয়ন করা তাদের অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ যা গণতন্ত্রের মূলনীতির সাথে কোনোভাবেই যায় না। সকল জনগণ যে সিস্টেমে সমান, নারী পুরুষ ভেদাভেদ সে সিস্টেমে গ্রহণযোগ্য নয়।

গণতন্ত্রবাদীদের বলে দেখুন, আমরা কুরআন-সুন্নাহর শাসন চাই। কুরআন, সুন্নাহ বা আলেমদের ঐকমত্য ব্যতীত কোনো জনগণ বা জনপ্রতিনিধি আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। বলুন, হুদুদ কায়েম করতে চাই। সমুদ্রতীরে ও পথে-ঘাটে নগ্নতা প্রতিরোধ করতে চাই। আল্লহর সাথে শিরক ও পূজা অর্চনা, মুর্তি নির্মাণ প্রতিরোধ করতে চাই। একই সময়ে আমরা গণতান্ত্রিকও থাকতে চাই।

জিজ্ঞেস করে দেখুন তারা কী বলে। তারা তৎক্ষণাৎ বলবে, এই গণতন্ত্র আমরা চিনি না। গণতন্ত্রে তো সকল আইন জনগণ প্রণয়ন করে, গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। যে ধর্মত্যাগ করতে চায় সে স্বাধীন। যে নারীসঙ্গী বা গার্লফ্রেন্ড যোগাড় করতে চায় সে স্বাধীন। যে মডেলিং করতে চায় সে স্বাধীন। তোমাদের এই ইচ্ছা পূরণকারী জীবনব্যবস্থার জন্য আরেকটি নাম খুঁজে নাও না কেন?

তাহলে কেন আমরা আমাদের ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র নাম দিতে বদ্ধপরিকর? ইসলাম নাম দিতে পারছি না কেন?

এগুলো হলো আমাদের পরাজিত মানসিকতা যা আমাদের অগোচরেই মননে মগজে জায়গা করে নিয়েছে। আল্লহর সেই ওয়াদা ভুলিয়ে দিয়েছে :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰي لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۗ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক। (সূরা নূর : ৫৫)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সদা সত্যের উপর থাকবে এবং তারা থাকবে সদা জয়যুক্ত। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই অবস্থাই থাকবে। আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা এসে যাবে। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এই দলটিই সর্বশেষে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। আর একটি হাদীসে আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ পর্যন্ত এই লোকগুলো কাফিরদের উপর জয়যুক্ত থাকবে (তাফসির ইবনে কাসির থেকে উক্ত আয়াতের তাফসির অংশবিশেষ)।

উমর (রা) বলেছেন,

نحن قوم أعزَّنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزَّة في غيره أذلَّنا الله

"আমরা এমন জাতি যাদেরকে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, অতএব ইসলাম ব্যতীত অন্য কোথাও যদি সম্মান তালাশ করি, আল্লাহ আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।"

জামাআতবদ্ধ থাকা

জামাআতবদ্ধ থাকা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। কুরআনে এসেছে :

সুরা আল-ইমরান (৩:১০৩)
আয়াত:

"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না... (সুরা আলে ইমরান ১০৩)

হাদিসে এসেছে,
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ

তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হলো এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হলো। (তিরমিযী)

এরকম বহু হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয় জামাআতবদ্ধ থাকার বিষয়টি যা মুমিনদের জন্য নিঃসন্দেহে কল্যাণকর নির্দেশ। যখন থেকেই খিলাফতের পতন হতে শুরু করে ও মুসলিম ভূখণ্ড খন্ডবিখন্ড হতে শুরু করে তখন থেকেই পরাজয় বরণ ও পরাজিত মানসিকতা লালন শুরু হয়।

প্রশ্ন জাগে কোন জামাআতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?
রসূল ﷺ বলেছেন,
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল হকের জন্য লড়াই (ক্বিতাল) অব্যাহত রাখবে এবং তারা বিজয়ী থাকবে। (তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আমর বিন মাইমুন রাহিমাহুল্লাহকে বলেন, জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠই হলো যারা জামাত (এর আদর্শ) থেকে বিচ্ছিন্ন। জামাত হলো যা হক অনুযায়ী হয়, তুমি একজন একা হলেও।

নুআইম বিন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জামাত যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তুমি নষ্ট হওয়ার পূর্বকালীন জামাতের আদর্শ আঁকড়ে ধরে থাকো। তখন তুমি একাকী হলেও তুমিই হবে জামাত।

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পূর্ববর্তীদের মধ্যে সবচেয়ে কমসংখ্যক মানুষ ছিলেন আহলুস সুন্নাহ। তারা অবশিষ্টদের মধ্যেও সংখ্যায় সবচেয়ে নগণ্য। যারা বিলাসীদের সঙ্গে বিলাসিতায় লিপ্ত হয়নি। এবং আহলে বিদআতের সঙ্গে মিলে বিদআতে লিপ্ত হয়নি। মৃত্যু পর্যন্ত তারা সুন্নাহর আদর্শে অটল ছিলেন। তোমরা তাদের মতো হও।

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জেনে রেখো, ইজমা (ঐক্যমত), হুজ্জাহ (প্রমাণ) ও সাওয়াদে আজম (হাদিসে বর্ণিত বৃহত্তম দল) হলো হকপন্থি আলেম। একাকী একজন হলেও। এমনকি ভূপৃষ্ঠের সকলে তার বিরোধিতা করলেও।

এ থেকে বোঝা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সংখ্যাধিক্যই সঠিক জামাআতের চিহ্ন নয়। বরং যে জামাআত কুরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে এবং বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, ক্বিতালকে অস্বীকার করে না এবং ক্বিতালের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ চালিয়ে যায়, এরাই হক্ব জামাআত, সংখ্যায় অল্প হোক বা বেশি।

আল্লহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

...كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ...ۗ

তারা বলল, 'কতই না ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলকে পরাজিত করেছে'! (সূরা বাকারা ২৪৯)

আত তইফাতুল মানসুরাহ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দলের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

طوبَى للغرباء طوبى للغرباء قيل ومن الغرباء قال ناس صالحون قليل في ناس سوءٍ كثير من يعصيهم أكثرُ مِمَّن يُطيعهم-

সুসংবাদ অপরিচিত লোকদের জন্য। জিজ্ঞাসা করা হলো, অপরিচিত লোক কারা হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, অনেক মন্দ লোকের মাঝে অল্পকিছু সৎ লোক। তাদের অবাধ্য লোক তাদের অনুগত লোকদের থেকে বেশি। (আহমাদ, তাবারানি)

যদি হক্বপন্থীরা গুরাবা-ই হয়ে থাকে যাদের অনুগতদের তুলনায় অবাধ্যদের সংখ্যা বেশি তবে অনুগত জামাআতের সংখ্যার ভিত্তিতে কীভাবে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে! বরং তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে অপরিচিত অবস্থাতেই, তাদের খুঁজে নিতে বহু প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তাদেরকে আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হলেও তারা হক্বের উপর একতাবদ্ধ।

কাজেই জামাআতবদ্ধ থাকার জন্য হক্বের অধিক নিকটবর্তী, সুন্নাহকে অধিক আঁকড়ে থাকা ও ধারণকারী, ইসলাম কায়েমের জন্য সুন্নাহ মোতাবেক অধিক প্রচেষ্টাকারী দলের সাথেই যুক্ত থাকা কাম্য, জামাআতবদ্ধ থাকার অযুহাতে এমন গাছের ডালে ঝুলে পড়া যাবে না যার শিকড় ত্রুটিযুক্ত, যেখানে কি না অধিকতর হক্ব জামাআত উপস্থিত থাকে।

ভোট ব্যবস্থা

ভোট ব্যবস্থা গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ আনুষঙ্গিক দিক, যার অনুপস্থিতিতে গণতন্ত্র কল্পনা করা অসম্ভব। ভোট ব্যবস্থা হলো অধিকাংশের মতামত সংগ্রহ করার একটি মাধ্যম, যার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন কিংবা আইন প্রণয়নের মতো কাজগুলো সম্পন্ন হয়ে থাকে।
ভোট কী?
হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. এ সংক্রান্ত একটি পুস্তিকায় লিখেছেন যে,ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট হচ্ছে তিনটি বিষয়ের সমষ্টি। ১. সাক্ষ্য প্রদান ২. সুপারিশ ও ৩. প্রতিনিধিত্বের অথরিটি প্রদান।

১. পূর্বে আলোচনা গত হয়েছে যে, ভোট হলো সাক্ষ্যদান। কাজেই ইসলামি শরীয়তে ভোট প্রদানের হুকুম সাক্ষ্যদানের অনুরূপ। সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে ধর্তব্য বিষয় দুটি- যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে কিংবা যারা সাক্ষ্য দিচ্ছে।
যারা সাক্ষ্য দিচ্ছে (সাক্ষ্যদাতাদের) মুসলিম ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। অথচ ভোটের ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করে।
কাউকে ভোট দেওয়ার অর্থ হল, তার ব্যাপারে এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, লোকটি ভালো এবং যোগ্য। এখন যদি যথাযথ জায়গায় সীল দিয়ে এ সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তবে সে হবে সত্য সাক্ষী অন্যথায় হবে মিথ্যা সাক্ষী। অথচ যারা নির্বাচন পদপ্রার্থী হয় তাদের অনেকেই প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যও নয়। এতে করে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে।

সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় হযরত আবু বকর রা. বলেন যে, রাসূলুল্লাহ একদা এক জায়গায় হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় তিন তিনবার সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে বড় কবীরা গুনাহের কথা বলব? সাহাবীগণ হ্যাঁ সূচক উত্তর দেওয়ার পর তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা (এ দুটি কথা বলার পর তিনি সোজা হয়ে বসলেন) এবং বললেন, শুনে নাও! মিথ্যা সাক্ষ্য অনেক বড় কবীরা গুনাহ।

সু-বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. মিথ্যা সাক্ষ্যকে চারটি বড় গুনাহের সমষ্টি বলে আখ্যা দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে : ১) নিজে মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ করছে ২) যার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে তার উপর যুলুম করছে ৩) যার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে তার উপরও প্রকৃতপক্ষে যুলুম করছে কারণ, সে যা কিছু পাওয়ার যোগ্য ছিল না এ ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্যদানের

মাধ্যমে তাকে এর অধিকারী করে তুলছে এবং এভাবে তাকে করছে জাহান্নামী ৪) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার একটি হালাল কাজকে হারাম বানিয়ে নেওয়া।

২. নির্বাচনে পদপ্রার্থীরা ক্ষমতা লাভের আশায় বহু সম্পদ খরচ করে। কিছু কিছু দেশে দেখা যায় যে, টাকা ও খাদ্যের বিনিময়ে লোকদের দিয়ে আন্দোলন করাচ্ছে।
সহিহ হাদিসে ইরশাদ হয়েছে,

إنا والله لا نُوَلّي على هذا العَمَلِ أحداً سَألَهُ ولا أحَداً حَرِصَ عليه

নিশ্চয় আমরা এই কাজের ভার এমন কাউকে দিই না যে তা চায়। এবং এমন কাউকে দিই না যে তার আশা রাখে। (সহীহ মুসলিম)

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, তারা ভোট পাওয়ার জন্য মানুষের নিকট কী পরিমাণ জোড়াজুড়ি করে?
কেউ যদি প্রশ্ন করে, শরিয়তে তো এমন দলিলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে যা পদ চেয়ে নেওয়ার বৈধতা রয়েছে বোঝায়। যেমন ইউসুফ আ. চেয়ে নেওয়ার ঘটনা।
ইউসূফ আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে জানা যায় যে তিনি কোনো একটা পদ পাবেন-এটা চূড়ান্ত হয়েই গিয়েছিলো। চূড়ান্ত হওয়ার পর তিনি নিজের যোগ্যতা অনুসারে সেই দায়িত্ব চেয়েছেন যেটার আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আল্লহ কর্তৃক নির্দেশিত, কেননা নবীরা যা সিদ্ধান্ত নেন তা আল্লহ কর্তৃক ইঙ্গিতপ্রাপ্ত হয়েই নেন।

পদ চেয়ে নেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত বক্তব্য হলো তা বৈধ নয়। যা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হাদিস থেকে বুঝে আসে।
তবে যদি কখনো সংকটময় পরিস্থিতি তৈরি হয় (চেয়ে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় না থাকে) তাহলে ভিন্ন কথা। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনের কারণে বিভিন্ন শর্ত-শারায়েতের আলোকে তা বৈধ হতে পারে। তবে এই সংকটময় পরিস্থিতি বৈধ হওয়ার ওপর প্রার্থীদের ভোট চাওয়ার কিয়াস কোনোক্রমেই সঠিক হবে না। কারণ, উভয়ের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৩. ভোট ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু দল ও মতের মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও নির্বাচন হয়। অথচ মুসলিমদেরকে জামাআতবদ্ধ থাকার নির্দেশ এবং পরস্পর ঝগড়াবিবাদে জড়ানো কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ভোট ব্যবস্থা সেগুলোর দিকেই উসকে দেয়। বহু দল বা বহু প্রতিনিধি প্রার্থী ছাড়া ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন সম্ভব নয়।

দল ও প্রার্থী ভিত্তিক এই নির্বাচনী ব্যবস্থার কুফল হিসাবে সমাজিক দ্বন্দ্ব, রেষারেষি ও খুন-খারাবি কমবেশি সব দেশেই সমান। এমনকি এর ফলে সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট পারিবারিক ব্যবস্থা পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ছে। সুশাসনের নামে ও নেতৃত্বের সুঁড়সুড়ি দিয়ে মানুষকে একাজে নামানো হলেও পরিণামে জনগণই শোষিত ও বঞ্চিত হয়।
তাছাড়া অনেকেই ক্ষমতার লোভে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিংবা ক্ষমতাসীনদের দলে জড়ো হয়। সেখানে সুশাসনের চেয়ে পদ পদবীর ক্ষমতার লোভই বেশি থাকে।

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন,
"বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বের সর্বত্র সামাজিক অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্রচলিত এই নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। কেন্দ্রে ও স্থানীয় সংস্থাসমূহের সর্বত্র এই নির্বাচনি ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সর্বত্র নেতৃত্বের লড়াই, পারস্পরিক হিংসা-হানাহানি এবং সামাজিক অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে।"

৪. একজন মুসলিম যখন পদপ্রার্থী হয়, সকল প্রকার নিয়মকানুনের সাথে একমত হয়েই তাকে নির্বাচনে লড়তে হয়। সেই নিয়মকানুনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে কুফরী নীতিমালাও। যদি সে দাবি করে অন্তরে তার নিয়ত অন্যরকম, তাহলে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে নির্বাচনী ম্যান্ডেটের সাথে একমত হয়ে সে কি জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছে বলে ধর্তব্য হবে না? কারণ তার অন্তরের নিয়ত তো জনগণ দেখে না, দেখে সেটাই যার উপর তার শপথ। যেমনটা আগেও উল্লেখিত হয়েছে।

৫. ভোট ব্যবস্থা আল্লহর প্রেরিত ঐশী ব্যবস্থার সাথে ঠাট্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেখানে জনগণকে সুশাসনের নামে ধোঁকা দিয়ে বিভক্ত করা হয়, প্রতারিত করা হয়। যেখানে আল্লহর বিধানের সম্মানকে কেড়ে নেওয়া হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, মানুষের আইন।
ভোট পদ্ধতি কেন ধোঁকা সে ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

গণতন্ত্র একটি আই ওয়াশ

প্রথমত, যে কটি মুসলিম দেশে এখন নামকাওয়াস্তে তথাকথিত গণতন্ত্র আছে সেগুলোর কোনোটিতেই গণতন্ত্র জনগণের মতামত নিয়ে আরোপ করা হয়নি। জোর করে চাপিয়ে দেয়া

হয়েছে। তা না হলে তারা জনগণের কাছে অপশন দিত যে, জনগণ কি ‘ইসলামি শাসন ব্যবস্থা’ চায়, নাকি ‘গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা’ চায়।

ভোট পদ্ধতির দাবি হলো, অধিকাংশের মতামত নিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন হয়। এই কথাটি সুস্পষ্ট ধোঁকা।

ধরে নেওয়া যাক নির্বাচনের জন্য পাঁচটি দল অংশগ্রহণ করল। প্রথম দল ৩০% ভোট পেল, দ্বিতীয় দল পেল ২৫% ভোট, তৃতীয় দল ২০% পেল, চতুর্থ দল পেল ১৫% ভোট এবং পঞ্চম দল পেল ১০% ভোট।
গণতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী এই সমস্ত দলের মধ্য হতে দেশ শাসন করার অধিকার রাখে ওই দল যে ৩০% ভোট পেয়েছে।
পক্ষান্তরে অবশিষ্ট ৭০% ভোটারগণ তাকে চায় না। যদি তা সত্ত্বেও তার সাথে সেসব লোকের সংখ্যাও যোগ করা হয় যারা ভোট দেয়নি, তাদের সংখ্যা নির্বাচনের অংশগ্রহণ করা লোকদের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা অধিকাংশের ভোটে নির্বাচিত হয়নি এবং গণতন্ত্র অধিকাংশের মতকে গ্রহণ করে না। যা একটি আই ওয়াশ অধিকাংশের সিদ্ধান্তের নামে!

এরপর আসে, কারা নির্বাচনে জয়লাভ করবে। এক্ষেত্রে প্রচারণা বড় একটি ফ্যাক্ট। যে যত বেশি খরচ করতে পারে প্রচারণার পেছনে, তার জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। অর্থাৎ, যার যত বেশি সামর্থ্য প্রচারণা করার তার পাল্লাই ভারী, যদিও তার চেয়ে যোগ্য কেউ থাকে। জনগণের জন্য জানার উপায় নেই যে কে অধিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে বরং যে যত বেশি প্রচারণামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে, যত বেশি লোকবল নিয়োগ করে কার্যসমাধা করতে পারে, তারই নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ে। যদিও সে বহু রসকস মিশিয়ে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।
এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় জনগণের আবেগের জায়গাটা দখল করার চেষ্টা করা হয়। যে এলাকায় যেরকম উন্নয়নের অভাব সেটার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। যে শ্রেণি-পেশার মানুষ বেশি তাদের মন জয়ের চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকদের নানাভাবে সাহায্য করা হয়, খাবার খাওয়ানো হয়। এসবই প্রচারণার স্বার্থে যা জনগণকে ধোঁকায় ফেলে।

মিডিয়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মিডিয়াশক্তি যার যতটা পক্ষে থাকে তার দিকে পাল্লাও তত হেঁলে থাকে। জনমত গঠনে মিডিয়ার প্রচার বা অপপ্রচার বেশ প্রভাব ফেলে।

প্রায়ই দেখা যায় নির্বাচনের আগে কোনো না কোনো প্রার্থীর আমলনামা বের হয়ে আসে। কোনো না কোনো কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ফাঁস হয়। যা ইচ্ছেকৃতই তাকে নির্বাচনে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য করা হয়।
এভাবে প্রচারণা বা অপপ্রচার, সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণ, রংমাখানো প্রতিশ্রুতি, অঢেল অর্থব্যয়, ক্ষমতার প্রয়োগ সবকিছুই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

সেখানে সত্যিকার অর্থেই কোনো জনদরদী নেতা থাকলেও এসকল দৌড়ে পিছিয়ে পড়লে নির্বাচনেও পরাজয় বরণ করতে হয়। সত্যিকার সৎ কোনো লোকের পক্ষে হাজার দুর্নীতি ও অপচেষ্টার ভীড়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য নয় বরং অসাধ্য বলেই মনে করি।

তাছাড়া জাল ভোট প্রদান, ভোট চুরির মতো ঘটনা তো অহরহই পাওয়া যায়। কয়েকটা কাগজে সিল মেরে দেওয়াই যদি যথেষ্ট হয় কাউকে মনোনীত করতে তবে এ আর অসম্ভব কি! যেখানে কোনো মানদন্ডের বালাই নেই, শরীয়াহর ছাঁকনিতে ছাঁকার প্রয়োজন নেই, কেবল কাগজে সিল দিলেই জনমত নেওয়া হয়ে যায়, আর জনমতই শাসক নির্বাচনে যথেষ্ট হয়ে যায় সেখানে কারচুপি হবে না তো কোথায় হবে?

পার্লামেন্টগুলোতে এমন আইনও পাশ হয়ে যায় যা জনগণ জানতে পর্যন্ত পারে না। অথচ সেসব নাকি অধিকাংশের ভোটে হয়! এগুলো করার মাধ্যমে শাসক তার শাসনকালের স্থায়ীত্ব দীর্ঘ করে নেয়।

মুসলিম দেশগুলোকে গনতন্ত্র নামক জাল দিয়ে বেঁধে পশ্চিমা ও ইহুদিবাদী শাসনের অনুগত করে রাখা হয়েছে। আসলে এটা একটা ফাঁদ। ইসলামি ভূখণ্ড এভাবেই একটু একটু করে মুসলিমদের হাতছাড়া হতে শুরু করেছে, হয় ভৌগোলিক কিংবা আদর্শিকভাবে। কারণ ক্ষমতাসীন দলগুলো নিজেদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে বিশ্বমোড়লদের দালালি করছে, তাদের আদর্শ বাস্তবায়ন করছে আর ইসলামি আদর্শকে জঙ্গিবাদ ট্যাগ লাগিয়ে দমন পীড়ন এবং খিলাফত ব্যবস্থাকে নানাভাবে বিকৃত উপস্থাপনের মাধ্যমে ঘৃণা সৃষ্টি করছে।

গণতন্ত্র নামক ধোঁকার মাধ্যমে আমাদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে ফিলিস্তিন ভূখন্ডও। সেনাবাহিনীর মাধ্যমে যা করা যায়নি সহজেই তা গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে হাসিল হয়ে গেলো! শান্তি প্রক্রিয়ার নামে গণতন্ত্র তাদের অস্ত্র।

মালয়েশিয়ার ভূমি ছিল সিঙ্গাপুর। কিন্তু কাফেরদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটের নামে মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরকে হারিয়েছে।
একই প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ সংখ্যাধিক্যের ভোটের নামে কাফেরদের হাতে তুলে দিতে হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব-তিমুরকে
মূল সুদান থেকে দক্ষিণ সুদানকে আলাদা করে দেওয়ার কথাও উঠেছে সংখ্যাধিক্যের আগ্রহের নামে। এভাবে প্রতিটি মুসলিম ভূখন্ডের পাহাড়ি অঞ্চলগুলো দিনদিন আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের ক্রুসেডারদের ঘাঁটি হয়ে উঠছে। তারা তাদের স্বার্থে গণতন্ত্র নামক ছুরি দিয়ে কেটে খন্ড খন্ড করে দিচ্ছে মুসলিম বিশ্বকে যা একতাবদ্ধ ছিলো খিলাফাহর পতাকাতলে।

বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের স্বরূপ

আমেরিকা : গণতন্ত্রের প্রবক্তা এই দেশটি উচ্চশিক্ষা কিংবা উন্নত জীবনযাপনের জন্য মুসলিমদের কাছেও বেশ আকাঙ্ক্ষিত। তথাকথিত গণতন্ত্রের লেবাসে যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন ইসলামোফোবিক নীতির কোনো পরিবর্তন হয় না, হবে না এটাই স্বাভাবিক। হিজাবধারী নারী কিংবা দাড়িওয়ালা পুরুষ শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার।
২০১৭ সালে কুইন্সে এক মুসলিম মহিলাকে হিজাব টেনে নামিয়ে আক্রমণ করা হয়।
টেক্সাস, ফ্লোরিডা, মিনেসোটাসহ অনেক স্থানে মসজিদে আগুন দেওয়া, গুলি চালানো ও ইসলামবিরোধী গ্রাফিতি আঁকার ঘটনা ঘটেছে।
হলিউড মুভিগুলোতে মুসলিমদের প্রায়ই "সন্ত্রাসী" বা "নিপীড়িত নারী" হিসাবে চিত্রিত করা হয়।
কুখ্যাত কারাগার গুয়ান্তানামো বে-এর নাম শুনেনি এমন কেউ বোধহয় নেই। সেখানকার ভয়াবহ নির্যাতনগুলো প্রমাণ বহন করে গণতন্ত্রের নামে শাসকগোষ্ঠী কতটা স্বৈরাচারী ও জালিম হয়ে উঠেছে।
বিবস্ত্র করে মারধর, কুকুরের মতো শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা, ছাদের সঙ্গে হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, শ্বাসরোধ করতে নাকে-মুখে পানি ঢালা, জোর করে নাক ও পায়ুপথ দিয়ে খাওয়ানোসহ আরো ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছে বন্দিরা।
আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী,
«কিউবায় যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত গুয়ানতানামো বে বন্দীশালাটির বয়স আজ ১১ জানুয়ারি ২৩ বছর পূর্ণ হলো। তবে এখানকার সাবেক বন্দী মানসুর আদায়ফি মনে করেন, এ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আসলে ২৩ বছরের ‘অবিচার, আইনহীনতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, নির্যাতন ও অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখার’ সংস্কৃতিরই নামান্তর।

যুক্তরাষ্ট্রের এ সামরিক কারাগারে একসময় প্রায় ৮০০ মুসলিম পুরুষকে বন্দী রাখা হয়েছিল।...» (১১ জানুয়ারি, ২০২৫)

যাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ভয়াবহ নির্যাতনের পর ক্ষতবিক্ষত, অর্ধমৃত, জীবন থেকে চলে গেছে অনেকগুলো বছর, আইনি লড়াইয়ে খুইয়ে ফেলতে হয়েছে সমস্ত সহায় সম্পদও। এদিকে অনেক বন্দি সমস্ত জীবনীশক্তি খুইয়েও এখনো বন্দিত্বের অন্ধপ্রকোষ্ঠে, যাদের মধ্যে আছেন আফিয়া সিদ্দিকী। তার উপর ঘটে যাওয়া অবর্ণনীয় নির্যাতনের বর্ণনা পাওয়া যায় 'আফিয়া সিদ্দিকী : গ্রে লেডি অব বাগরাম' নামক বইতে।

চীন : ২০১৮ এর রিপোর্ট অনুযায়ী, জাতিসংঘের একটি কমিটি জানতে পেরেছে যে ১০ লাখের মতো উইঘুর মুসলিমকে পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং অঞ্চলে কয়েকটি শিবিরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো আরো বলছে, এসব ক্যাম্পে যাদেরকে রাখা হয়েছে তাদেরকে চীনা ম্যান্ডারিন ভাষা শেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর অনুগত থাকতে। আরো বলা হচ্ছে, তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সমালোচনা করতে অথবা সেই ধর্ম পরিত্যাগ করতে।
এই হলো তাদের অবস্থা!
(যদিও চীন পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নয়, সমাজতান্ত্রিক। তবে গণতন্ত্রের অনেককিছুর সাথে তাদের শাসনব্যবস্থার মিল রয়েছে)

ব্রিটেন : রাজনীতিবিদ বরিস জনসন এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন বোরকা 'নিপীড়নমূলক' পোশাক। তিনি বোরকা সম্পর্কে কটূক্তি করে আরও বলেছেন, যে নারীরা বোরকা পরেন তাদের দেখতে 'ব্যাংক ডাকাত' বলে মনে হয়।
ইহুদিদের সন্তুষ্ট করার প্রবণতা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে।

বিবিসি ২০১৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী,
«ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির সমর্থক গোষ্ঠী 'দা ওভারসিজ ফ্রেন্ডস' সম্প্রতি টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, যুক্তরাজ্যের হিন্দুরা যাতে লেবার পার্টকে ভোট না দেয় সেজন্য তারা কনজারভেটিভ প্রার্থীদের সাথে কাজ করছেন।
কাশ্মীরে বিজেপি সরকারের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছে লেবার পার্টি। সেটিই এখানে কারণ।

ব্রিটেনে দশ লাখের মতো হিন্দু জনগোষ্ঠী রয়েছে। ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত কনজারভেটিভদের পক্ষে হিন্দুদের ভোট বেড়েছে দশ শতাংশ» (বিবিসি রিপোর্ট, ২০১৯)

এগুলোই প্রমাণ করে যতই ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করা হোক না কেন, ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বীদের ভোট আকর্ষণের জন্য তাদের সন্তুষ্টিকরণ, তাদের সমর্থন আদায়ে ইসলামবিদ্বেষের আশ্রয়গ্রহণ ক্ষমতায় যাওয়ার একেকটা সিঁড়ি হয়ে গিয়েছে।
এই ব্রিটেনই ছিলো ফিলিস্তিনকে ইসরায়েলের কাছে তুলে দেওয়ার ভূমিকায়।
তাছাড়া মুসলিমদের নানাভাবে হয়রানি করার ঘটনা তো আছেই।

ফ্রান্স : ২০০৪ সালে স্কুলে নিষিদ্ধ হয় হিজাব, ২০১০ সালে নিষিদ্ধ হয় নিকাব।
২০২০ সালে প্যারিসের কাছে একটি মসজিদে হামলা হয়, আরেকটি মসজিদের বাইরে শূকরের মাথা রাখা হয় এবং ইসলামবিরোধী grafitti আঁকা হয়।
প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, অন্যান্য রাজনীতিক যেমন মেরিন লে পেন এবং এরিক জেমমুর মতো নেতারা প্রায়ই মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দেন, যেমন "ইসলাম ফ্রান্সের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়"।
ফরাসি মিডিয়ায় ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাঙ্গ করে লেখা, চিত্র প্রকাশের ঘটনা প্রায়ই ঘটে, যেমন চার্লি হেবদোর রসূল ﷺ কে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক ক্যারিকেচার। (নাউজুবিল্লাহ)

কানাডা : বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামি সেন্টারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে ইসলামি কোনো শিআর (পর্দা বা দাড়ি) এর ব্যাপারে বিদ্বেষমূলক আচরণ করা হয়। অথচ গণতন্ত্রের দাবি প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম বা মতাদর্শ লালনের অধিকার পাবে।

ভারত : ভারত আরেকটি ইসরায়েলের রূপ ধারণ করেছে, মুসলিম নিপীড়নে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সম্প্রতি আইন করে মসজিদ ও মাদ্রাসা ভেঙে ফেলা, মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়াসহ নানাভাবে প্রকাশে মুসলিমদের হয়রানি চলছে, মুসলিমদের নানা অজুহাতে ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। গরুর মাংস পাওয়া যাওয়ায় নির্মম নির্যাতন করে মেরে ফেলা হচ্ছে। এসবই ক্ষমতাসীন যে দল চালিয়ে যাচ্ছে তাদের রয়েছে জনগণের বিরাট অংশের মদদ ও সমর্থন। বড় একটি অংশ একে কোনো অপরাধই মনে করে না, বরং সমর্থন জানায়!

এই হল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুসলিম নিধনের চিত্র!

মুসলিম দেশগুলোতেও গণতন্ত্র কোনো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বরং সেক্যুলারিজম বিস্তারের পথকে প্রশস্ত করেছে।

পশ্চিমা গ্রিকীয় গণতন্ত্র বা আইন প্রণয়নে মানুষের সার্বভৌমত্বের গণতন্ত্র পশ্চিমা বিশ্বে রাসুল ও তার সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবেতাবেইনদের সময়েও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, ওই আদর্শ তারা কখনো রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার নীতি বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেননি। কারণ, সাহাবিরা ও পরবর্তী খলিফাগণ জানতেন ইসলামি ব্যবস্থাকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ খিলাফত ব্যবস্থা উসমানীয় খিলাফতও টিকে ছিল আধুনিক গণতন্ত্রের জয়জয়কারের মধ্যে। ১৯২০ সালে এর ভাঙ্গনের প্রান্ত বেলায়ও, উসমানীয় খিলাফতের খলিফা ব্রিটেন-ফ্রান্সের চাপের মুখেও গণতন্ত্র বাস্তবায়নে নারাজ ছিলেন। ১৯২০ সালে উসমানীয় খিলাফত ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়ায় ব্রিটেনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ও ভারতের মানুষ খিলাফত আন্দোলন করেছে।